বিষ্ণু দে ও তাঁর তিন বন্ধু
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনী রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

অরুণ সেন

বিষ্ণু দে-র সঙ্গে কতজনের যে বন্ধুত্ব সারাজীবন ধরে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন কর্মের বা শিল্পের প্রেরণায় ও পথচলায়, তার তো শেষ নেই। কলকাতার যে-বৃহৎ বনেদি যৌথ পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে জ্যেষ্ঠ আত্মীয়পরিজনের মধ্যেই সেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে—পুরোনো বাড়িতে জ্যাঠাবাবুর বইয়ের আলমারির সামনে যেমন, তেমনি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের নতুন বাড়িতে বাবার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে লেখাপড়া নিয়ে গল্প করতে-করতে। (দ্র. বিষ্ণু দে-র *ছড়ানো এই জীবন*)। তাই তো বলেছেন, তিনি সেখানে, "ছোটোবেলা থেকেই বাবার সমর্থনেই আমি আমার সাহিত্যচর্চা এবং নিজের খুশিমতো পড়াশোনা চালাতে পেরেছি। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত সহজ ছিল—কিছু ভালো লাগলে বাবার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতুম—বাবা তাঁর মতামত দিতেন।" প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অনেকেই ছিলেন বিষ্ণু দে-র বন্ধুতুল্য। স্কুলের কোনো শিক্ষক তাঁকে ছবির অ্যালবাম কিনে দিয়ে ছবির বিষয়ে আলোচনা করতেন। কলেজের সাহেব-শিক্ষকেরা কেউ-কেউ পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে তুলতেন। ছাত্র-বয়সেই শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে সহপাঠী বন্ধু ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ক্ষিতীশ রায় এবং আরো অনেকে। আর ছাত্র-জীবনের কোঠা পার করে যখন কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হলেন, তখন তাঁর সহকর্মী বন্ধু বুদ্ধদেব বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সেই সঙ্গে তো ছিলেনই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তার বাইরেও ছিলেন, হয়তো একটু পরিণততর বয়সে, যামিনী রায় বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রত্যেকেই সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ। এঁরা বয়সে এগিয়ে থাকলেও বিষ্ণু দে-কে বন্ধু হিশেবেই গণ্য করতেন, বা বলা যায়, পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই সত্য ছিল তাঁদের মধ্যে। আর পাশাপাশি কমবেশি কনিষ্ঠদের মধ্য থেকে পেয়েছি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। প্রসঙ্গ- ক্রমে অবিস্মরণীয়, সহপাঠী বন্ধুদের যে-পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন কুমিল্লা থেকে আগত ব্রাহ্মকন্যা প্রণতি রায়চৌধুরী, পরবর্তীকালে তার সঙ্গেই বিষ্ণু দে-র প্রণয় ও পরিণয় হয়। এবং সেও তো বন্ধুত্বই বটে, যাকে নিয়ে কবি দেন উপমা—সেই-সব 'নবীন প্রবীণ' 'সহচর বন্ধুদের' মধ্যে "চেনা, আধচেনা, সহচরী, বিস্তৃত, বাস্তব,/পাঞ্চালী, উলূপী আর তুমি পতিব্রতা।" যামিনী রায় ছাড়া শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সেই নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, হেমন্ত মিশ্র, পরিতোষ সেন প্রমুখ চিরকালই তাঁর সাহচর্য লালন করতেন। সমকালীন শিল্পীদের প্রতি বিষ্ণু দে-র আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় ক্যালকাটা গ্রুপ সম্পর্কে তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে এবং কবির বিষয়ে তাঁদের

পরবর্তী স্মৃতিমূলক বন্ধুভাবের আত্মপ্রকাশে। সমধিক আকর্ষণ ছিল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে। সেই 'কল্লোল' যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'পরিচয়'-এর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'কবিতা'-র বুদ্ধদেব বসু (যদিও বন্ধুত্বের ক্রমিক পর্যায়ে সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বিষয়ে তাঁর এককালীন ব্যবধানের কথাও আমরা সবাই জানি)। বিষ্ণু দে-র কবিসত্তা, শিল্পীসত্তা বা এককথায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার গড়নে একটা বড়ো ভূমিকা তো তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, যা নিহিত তাঁর নিজস্ব মার্কসবাদী বিচারে ও আনুগত্যে। এ নিয়ে বিস্তর ওঠাপড়া আছে, সেখানেও উপস্থিত তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা। ব্যক্তির প্রভাবের বিচারে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সাবেক বন্ধুত্বের ইতিহাস আছে—কলেজের স্টাফরুমের কথালাপ, মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের চিন্তা-বিনিময়, বিভিন্ন আন্দোলনে সাংস্কৃতিক মাত্রা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে। সেই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গে পূরণচাঁদ যোশী বা বিখ্যাত পি সি যোশীর বন্ধুত্ব লাভ—তার স্বীকৃতি আছে উভয়ের প্রতি নিবেদিত বিষ্ণু দে-র প্রকাশিত গ্রন্থে। তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ-সংকলন **'In the Sun and the Rain/Essays on Aesthetics'** গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : **I dedicate this book to two of my very good friends for three decades and a half–P. C. Joshi and Hirendranath Mukherjee**। বলাবাহুল্য, যোশী ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং হীরেন্দ্রনাথ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা। এর বাইরে অনেকেই ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিণামেই মার্কসবাদ বা কমিউনিস্ট পার্টির একসময় ক্রমশই দূরত্ব তৈরি হয়

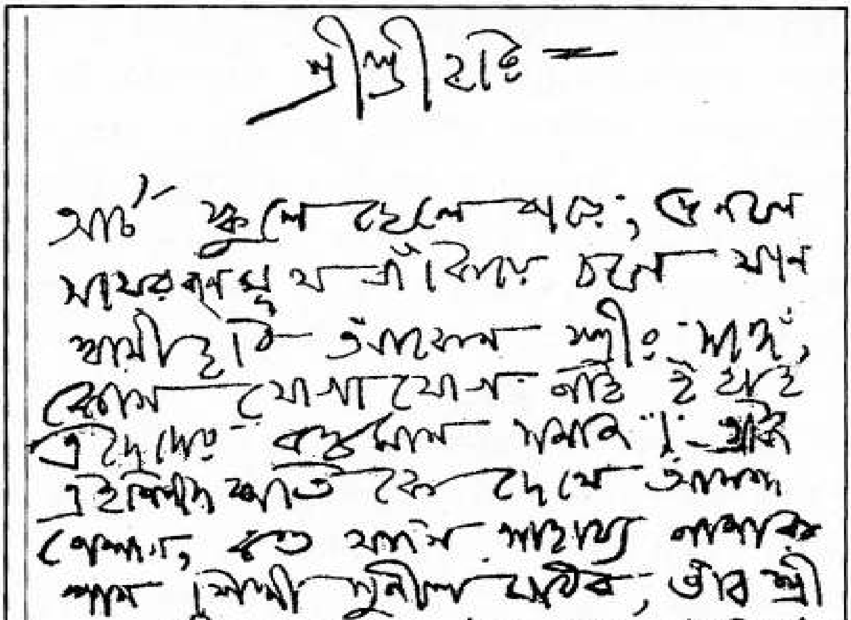
শ্রীশ্রীহরি

শিল্পী সুনীল ঘোষ, তাঁর স্ত্রী

শ্রীযামিনীরায়

বিষ্ণু দে-কে লেখা যামিনী রায়ের একটি চিঠি

তাঁর, এবং তাঁদের সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র মূল্যায়ন যেমন তীব্র সমালোচিত, তেমনি অনুকূল বন্ধুত্বও ভাষা পায় তাঁর অনুজ বন্ধুদের উপলব্ধিতে—তা সে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, আশীষ বর্মণ হোন কিংবা অশোক সেন। কিংবা পরবর্তী লেখক-কর্মী, যাঁদের বিষ্ণু দে বলতেন 'সাহিত্যপত্রী', এমনকী তাঁদের সময় পর্যন্তও। এতৎসত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র জীবনের সঙ্গে যাঁরা ব্যাপক পরিচিত, তাঁরা জানেন বন্ধুত্বের বিস্তার আরো কতখানি ছড়িয়ে আছে।

দুই.

তবু, এরই মধ্যে তিনজনের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র বন্ধুত্বের গভীরতা প্রায় কিংবদন্তিতে রূপ পেয়েছে, বয়সের দূরত্ব যদি কখনো থেকেও থাকে তা বাধা হয়নি। বোধহয় সেই বন্ধুত্বের গাঢ়তার একটা বড়ো প্রমাণই হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর নিবিড় মুগ্ধতা, এবং তাঁদের আকস্মিক তিরোধানে তাঁর তুলনাহীন শোকগ্রস্ততা। প্রথমেই নাম করতে হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। আত্মীয়তার সূত্রে বাল্য বয়সে আলাপ হলেও, সাবালক বন্ধুত্বের সূচনা কবি টি এস এলিয়ট-এর সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ বিষয়ে উভয়ের মতৈক্য। সেটাই গিয়ে পৌঁছোল সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর 'বৈঠকে'—আবার সেটাই ছিল বস্তুত সম্পাদকের নিজস্ব ডেরা। এতই আকর্ষণ ব্যক্তি ও স্থানের যে সেখানে বিষ্ণু দে প্রায় সারাদিন কাটাতেন—প্রায়শই সকাল ১০-১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। ছদ্ম ভর্ৎসনার সুরে বাবা অবিনাশচন্দ্র দে বলতেন, "সুধীনকে বোলো তোমাকে একটু কিছু খেতে দিতে।" আর প্রণতি অভিমানভরে 'ঝগড়া' করতেন, "সুধীনবাবুর বাড়ি গিয়ে থাকলেই পারো—আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?" (দুটি উদ্ধৃতিই প্রণতি দে-র চিঠি থেকে পাওয়া)। বিষ্ণু দে প্রথম দেখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথকে যখন রূপোজ্জ্বল ওই যুবা মামা নীরদ বসু মল্লিকের সঙ্গে তাঁদের কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে আসতেন সাহেবি পোষাকে কিংবা লাল সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে। বিষ্ণু দে-র সম্পর্কিত মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহও হয় সুধীন্দ্রনাথের। কিন্তু প্রকৃত সংযোগ ঘটে তাঁদের মধ্যে তিরিশের শুরুতে, সাহিত্যগত ঔৎসুক্য যখন দানা বাঁধতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে তার কেন্দ্র ছিল এলিয়ট এবং 'পরিচয়' পত্রিকা। সুধীন্দ্রনাথ যেমন কলকাতার সংস্কৃতি-মহলে তখন দেদীপ্যমান, বিষ্ণু দে-র সর্বাঙ্গীণ দীপ্তিতে সুধীন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিত, যা প্রকাশিত হয়েছে বিষ্ণু দে-কে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতেই। এলিয়ট-বিষয়ে আদি প্যারাগ্রাফটি শেষ করেই সুধীন্দ্রনাথ অনুজ বন্ধুকে জানালেন, "আসল কথা হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। [আগের সাক্ষাতের কথা সব ভুলে গেছেন তিনি ততদিনে।] চিঠি লেখার কায়দায়, কথার ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট পরিচয়ের যাদুতে আপনি আমাকে এতই কৌতূহলী করে তুলেছেন, যে এর পরে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ না-দেওয়াটা খুবই অন্যায় হবে। অতএব যদি অনুগ্রহ করে এদিকে একদিন আসেন তাহলে আমার সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসাগুলো স্বমুখে চরিতার্থ করার সৌভাগ্য ঘটে। আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও কিছু কম নয়। কাজেই সেটাও নিবারণ করতে পারবো।" এগুলো সবই উভয়ের বন্ধুত্বের বা সম্পর্ক-স্থাপনেরই অভিজ্ঞান। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় বা 'শুক্রবারের বৈঠকে' ফ্যাসিস্ট-বিরোধী তর্কবিতর্কে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমভাবাপন্ন একটা অবস্থান হয়তো ছিল। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে সুধীন্দ্রনাথ

যথেষ্ট প্রগতিমনা ছিলেন। অতঃপর হিটলারের সঙ্গে স্টালিনের চুক্তির পর্ব থেকেই মতান্তর। ফলত ব্যবধান আরো অনেকের সঙ্গেই বেড়ে গেল—এমনকী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি ছিলেন তাঁর guide, philosopher and friend, তাঁর সঙ্গেও সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। পরে অবশ্য সহধর্মিণী ও বন্ধুবান্ধবেরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন সেই দূরত্ব দূর করতে, কিন্তু তা সহজেই সম্ভব হয়েছে এমনও নয়। বিষ্ণু দে-রও অনীহা যেন কেটে যেতে চায়। সুধীন্দ্র-পত্নী রাজেশ্বরীর রবীন্দ্রসংগীত তাঁকে প্ররোচিত করে সেই অসামান্য কণ্ঠস্বর শোনার জন্যই তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে হাজির হওয়াতে। সুধীন্দ্রনাথও উদ্দীপ্ত হন প্রাক্তন বন্ধুর এই গুণগ্রাহিতায়। সেজে আসতে বলেন রাজেশ্বরীকে। নিজেও খুশি হন এই তারিফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই সকালের ক্লাসের বরাত থাকত সুধীন্দ্রনাথ ও প্রণতির। দুজনেই ইংরেজির শিক্ষক। সিনিয়র স্টাফরুমে দুজনের গাল-গল্পের অন্ত ছিল না—অনেক সময়ই বিষ্ণু ও সুধীনের, দুই পুরোনো বন্ধুর, অতীতের কাহিনি। খুবই শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন দুজনেই। প্রণতি দে জানিয়েছেন নবলব্ধ বন্ধুর কথা, "খুব দিলখোলা লোক ছিলেন এমনিতে এবং generousও।" দুজনের তিন অঙ্কের পদসঞ্চারের এই ইতিহাস 'এই মৈত্রী এই মনান্তর'-এ চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধু সুধীন্দ্রনাথের রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে নতুন করে বিষ্ণু দে যাওয়া শুরু করলেন তা-ই নয়, শেষ দিকে বিষ্ণু দে-র প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোডের ছোট্ট বাড়িতে চলে আসতেন সুধীন্দ্রনাথও। তাই মৈত্রী থেকে পরিত্যাগ, আবার যেন পুরোনো সম্পর্কের নতুন মাত্রায় ফিরে আসা। তবে, 'মৈত্রী' তো বোঝা গেল, 'মনান্তর' কেন? প্রশ্ন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথের ভাই শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত। তা-ই তো শেষ চিঠির আকুল অভিব্যক্তিতে জ্যেষ্ঠ বন্ধু লেখেন কনিষ্ঠ বন্ধুকে : "যদি কোনও দিন উত্তাপ কমে, তবে আসবেন আমাদের এখানে। অনেক কাল দেখা হয়নি।" চিঠিটি লেখা হয়েছিল, ১৬ জুন ১৯৬০। মাত্র দিন কয়েক পরে তাঁর মৃত্যু হয় ২৫ জুন ১৯৬০। কিছুদিন ঘোর কাটেনি বন্ধুর। অবশেষে ১৫ জুলাই ১৯৬০- তে লিখলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে উৎসর্গিত কবিতা 'বন্ধুস্মৃতি' :

শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা-র প্রচ্ছদ

এ আমার চেনা নদী, উঁচুনিচু, পাহাড়, প্রান্তর
সমতল পার হয় নানা বৈপরীত্যে দীর্ঘকাল,
উৎস থেকে পাড়ে পাড়ে—এই মৈত্রী! এই মনান্তর!

উপলে পলিতে তীব্র বিড়ম্বিত উল্লাসে ধিক্কারে
একালে, এদেশে, ক্ষুব্ধ আমাদের হাজার বিকারে।
আত্মসচেতন প্রাণ তাই উটপাখির মরুতে
হারাবে উৎসের দিশা? অর্থহীন ভূকম্পে নিঃসীম?
তাই দীপ্র যৌবনের দীপাবলি হয়েছে কি হিম
বৈদেহী নাস্তির গর্ভে? ব্যক্তিরূপ শূন্য পঞ্চভূতে?
তাই কি মুহূর্ত-তত্ত্বে মুমূর্ষার এত ক্ষিপ্র তাল?
বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহরে, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল
মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশ বছর;
কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উষ্ণ মতান্তরে
অগ্রজের সানুকম্প সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—
আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর।

তিন.

যামিনী রায়ের সঙ্গে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্কের শুরু প্রায় একই সময়ে। দুজনের বাগবাজারের বাড়ির ছবির প্রদর্শনীতে হাজির হওয়া এবং তাঁর চিত্রকলা ও তাঁর নন্দন বিষয়ে উৎসাহ বোধহয় একই সঙ্গে। বিষ্ণু দে মনে করতে পারেন, ১৯২৮ বা ২৯-এ জলধর সেনের ছেলে অজিত সেন তাঁকে প্রথম নিয়ে যান আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সরু গলিতে যামিনী রায়ের বাড়িতে সাজানো তাঁর ওই ছবি দেখাতে। পরে অনেকবার এখানে-ওখানে প্রদর্শনী হয় এবং সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু ছিলেন তার নিয়ত দর্শক। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর কথা তো উঠেছেই। তখন থেকেই জানি, যামিনী রায়ের ছবি পছন্দ করেছেন ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, পরন্তু রবীন্দ্রনাথ। 'কল্লোলে' তাঁর ছবি ছাপা হত—সেই কৌণিক রোগা শরীরের ছবি। কিন্তু, আধুনিকের চোখে যামিনী রায়ের ছবি যেন গ্রাহ্য হল এইবার প্রথম সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র চোখ দিয়ে। ১৯৩১-এ বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে প্রথম ছবি দেখতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠে আলপনা চোখে পড়লে বিষ্ণু দে-র খুব খারাপ লেগেছিল। পরে জানতে পেরেছিলেন যামিনী রায়েরও আপত্তি সমধিক। পরিকল্পনাটা ছিল নাকি স্টেলা ক্রমারিশের। যামিনী রায়ের সঙ্গে ওই দুই বন্ধুর সম্পর্ক ধাপে-ধাপে এগোতে থাকে। সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝেই আসতেন যামিনী রায়ের বাড়ি, খুবই সস্নেহ সম্পর্ক ছিল তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছবি-র সঙ্গে। পরে ছবি ও সুধীনের মনোমালিন্যের কারণে সম্পর্ক-ত্যাগও ঘটে। কিন্তু যামিনী রায়ের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র যোগাযোগ পারিবারিক, দীর্ঘ ও প্রায় আমৃত্যু। শুধু তাঁর একান্ত যামিনীদা-ই নয়, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গেও। কনিষ্ঠ অমিয় বা পটল তো বটেই। আর যামিনী রায় বিষ্ণু দে-র কলকাতার বাড়িতে প্রায়ই আসতেন তা-ই শুধু নয়, তাঁর স্ত্রী প্রণতি, দুই কন্যা ইরা-তারা, পুত্র ও পুত্রবধূ পপা-মীরা, সকলের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা। যামিনী রায়কে যেমন একবার মাত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি হাওড়ার পাঁতিহালে, বিষ্ণু দে কিন্তু লম্বা ছুটি কাটিয়েছেন যামিনী রায়ের দেশের বাড়ি বাঁকুড়ার বেলেতোড়ে। সেই সুখের দিনগুলির কথা

লিখেছেন প্রণতি দে তাঁর স্মৃতিচারণে। যামিনী রায় বিষ্ণু দে-র দক্ষিণ কলকাতার ভাড়াবাড়িতে আসতেন হরহামেশা। কোনো এক সময় দেশপ্রিয় পার্কের কাছের এক ভাড়াবাড়িতে ছাদের আড্ডা বসতো। সুধীন্দ্রনাথ বোধহয় এসেছিলেন একবার। যামিনী রায় প্রায়ই। আড্ডায় বসে-বসেই ছোটো-ছোটো ছবি আঁকতেন, কখনো তুলি-কলম নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৩৯-এ যামিনী রায় বিষয়ে একটি অসামান্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। বিষ্ণু দে-ই প্ররোচিত করেছিলেন 'সাহিত্যপত্র'-এ তার বঙ্গানুবাদ ছাপার জন্য। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই তো বিষ্ণু দে যামিনী রায়কে নিয়ে অনেক লিখেছেন। একের পর এক প্রবন্ধ বা যে-কোনো ধরনের গদ্যরচনায় কিংবা এক-একটি সম্পূর্ণ কবিতার বিষয় গৌরবে, বা নিহিত উপমায় বা উল্লেখে। যেমন একটি দৃষ্টান্তে, তিনি যে সামনে বসে শিল্পীর কর্ম ও বিস্তারকে দেখেন, তাকেই অবলম্বন করেন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর 'তাই তো তোমাকে চাই' কবিতাটিতে।

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার একটি বিস্তার
মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয় দিন, অথচ যামিনীদার
প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ, একটি প্রকাশ,
হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক
যেখানে সন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব
স্বয়ম্বশ স্বতন্ত্র স্বাধীন, অথচ রঙের প্রতি ঢেউএ ঢেউএ
দোলা দেয় পঞ্চাশ বছর, নিত্যকর্মী সমগ্র শিল্পীর জাগ্রত জীবন,
শুধু কি শিল্পীর, তার নিজের ঘরের, বংশের, দেশের
আধভোলা, ভোলা, চৈতন্যের, রক্তের প্রভাব,
সারা পৃথিবীর ছায়া, রৌদ্রে জলে রেখা রঙে
একটি ছবিতে উজ্জীবন প্রায় প্রত্যাভাস...।

দুজনের এই সম্পর্কের মানচিত্র শুধু প্রবন্ধ বা কবিতাতেই নয়, নানা প্রসঙ্গে কথালাপের অনুস্মৃতি, এবং পারস্পরিক অজস্র পত্রবিনিময়েও। সব সূত্রেই দুজনের ব্যক্তিগত সংলগ্নতা উঠে আসে। এবং তার মধ্যে নান্দনিক মতৈক্য ও নির্ভরতাও। যামিনী রায়ের চিঠির সংখ্যাধিক্য টের পাওয়া যায় প্রণতি দে-কৃত অনুলিপিতে। তিনি বিষ্ণু দে-কে লিখতেন :

> নিজের আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও আমার এতখানি চিন্তা! আমি ত কামনা করি আপনাদের সকল দিকে মঙ্গল হোক, তার পিছু পিছু আমারও হবে।...
>
> আমি যদি একটু ভাল ছবি আঁকতে পারি যেমন আপনাদের গৌরব, সেই রকম আমিও গৌরব বোধ করি আপনাদের কাজের মধ্যে। নানা দিকে দৈন্য না এলে চোখে দেখা জিনিষকে আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা মনে হচ্ছে ভুলে না গেলে দেখা হোলে বলব। ছবি এঁকেছি অনেক, আপনাদের ভাল লাগলে তবে আনন্দ...
>
> আপনাদের দেখা পেলেই আনন্দ, ইহা মধুর সম্পর্ক। সেদিনের আসা ও যাতায়াতে খুবই কষ্ট পেয়েছেন, জল ঝড়ের জন্য।... রোদের তেজ কম থাকলে একদিন আসুন।

শরীর যে আবার সুস্থ হবে, তা আর মনে হয় না। শরীর অসুস্থ, এই অজুহাতে,সামাজিক অনুষ্ঠানে, কিম্বা আপনাদের আহ্বানে না যাওয়ার মনোবৃত্তি আমার কোন দিনই নাই। বরং দেহটা যত পঙ্গু আর পরাধীন হচ্ছে বাইরে বেরুবার ইচ্ছেটা তত প্রবল হচ্ছে, এর জন্য মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। সেদিনও না যেতে পেরে খুবই লজ্জিত হোয়েছি।...

কিছুদিন থেকেই, —আপনার চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেই এত সমস্যা ও তত্ত্ব কথা বন্যার মত এসে পড়ে যা গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতা নাই অথচ না লিখেও মুক্তি নাই, বোধহয় এই ভাবে কিছু বেরিয়ে না গেলে ফেটে যেতাম।...

হয় দেখা সাক্ষাৎ, নয় চিঠি, দুটোর মধ্যে একটা না হোলে থাকি কি নিয়ে! খাওয়া, পূর্ব্ব অভ্যাস, রক্ত মাংসের দেহ মন, এর থেকে নিয়তি নাই।...

এরকম চিঠি অনেক এবং তাদের মধ্য দিয়েই দুই বন্ধুর সম্পর্কের নানা স্তর উন্মোচিত হয়। বিষ্ণু দে-ও নিশ্চয় যামিনী রায়কে অনেকই লিখেছেন (কিন্তু সেগুলো পাওয়া যায়নি, যেমন পাওয়া যায়নি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে লেখা চিঠি)। তাঁর বিষয়ে লেখালিখিতেই বরং সম্পর্কের এই ব্যক্তিগতও বেরিয়ে এসেছে পরোক্ষ অনুসন্ধান ও বিচারে। যামিনী রায়ের সঙ্গে বেতার-সাক্ষাৎকারে বিষ্ণু দে বলেন :

...আপনার ছবির যে সহজ সরল গুণ, সে তো সবাই মানে। তা আপনার অনেক ছবিই আছে যা শিশুদেরও ভালো লাগে, আবার বৃদ্ধদেরও ভালো লাগে, আবার যৌবনেও ভালো লাগে। আবার এমন অনেক ছবিও আছে যা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভালো লাগে। তবে একটা ব্যাপার থেকে যায় যে হলডেন যে বলেছিলেন, আপনার ছবি দেখে, যে, আপনার ছবি এমনিতে দেখে মনে হয় যে এত সরল, কিন্তু কেন এরকম মনে হয় যে বছরের পর বছর আপনার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, ক্লান্ত লাগে না, অথচ অন্যান্য অনেক শিল্পী যাঁরা আরো অনেক জটিল ছবি আঁকেন, তাঁর [তাঁদের] ছবি, অতদিন ধরে দেখা যায় না।

যামিনী রায় প্রায়ই বিষ্ণু ও প্রণতিকে ছবি উপহার দিতেন, এবং এ-সব ছবি ভরে থাকত তাঁদের বৈঠকখানা, শোয়ার ঘর, বারান্দা। বই ও খাতার ফাঁকে-ফাঁকে উপচে পড়ত অজস্র স্কেচ। পরন্তু ওঁরা নিজেরাও কিনতেন তাঁদের পছন্দমতো, সেই সঙ্গে বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনদেরও কেনাতেন নিজেরাই তদ্‌বির করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে-সব বিচক্ষণ ও বিদগ্ধ মার্কিন সৈনিকেরা কেউ-কেউ বিষ্ণু দে-র বন্ধু বলে গণ্য হতেন, তিনি তাঁদের যামিনী রায়ের বাড়িতে নিয়ে যেতেন ছবি দেখা ও কেনার জন্য। যামিনী রায় তা নিয়ে বিষ্ণুকে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল অনেকটাই (অন্তত ২২ বছর), কিন্তু যামিনী রায় তাঁকে প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু বলে মনে করতেন এবং প্রকাশ করতেন। অতঃপর সামান্য কনিষ্ঠরা তো নিতান্তই ছোটো। এর পর যামিনী রায় যখন একেবারে উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করে চলে এলেন (ডিহি শ্রীরামপুর লেনে বা বালিগঞ্জ প্লেসে) তখনও

লেকমার্কেটের সন্নিকট ভাড়াটে প্রতিবেশী বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যোগাযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত দুজনে দুজনের বাড়িতে যেতেন। যামিনীর চিত্রময় বাড়িতে বিষ্ণু তো বটেই। সারাদিন কাজের পরে সন্ধ্যায় শিল্পী উঠে যেতেন দোতলায়। তার আগেই কবি যেতেন, এবং দুজনে মোড়া পেতে অন্তরঙ্গ আলাপ চলত। এমনকী চেয়ে নিয়ে ধূমপান করতেও দেখা গেছে। বিষ্ণু দে কখনো-কখনো কনিষ্ঠ বন্ধুদেরও নিয়ে যেতেন এবং তাতে যামিনী রায় খুশি হতেন। পরবর্তীকালে, এ সময় থেকেই, যামিনী রায় ক্রমশই অসুস্থ, এবং বিষ্ণুর যাওয়াটাও বেড়ে যায়। তাঁর অস্থির ভাব রোগাচ্ছন্ন বন্ধুর বিছানার পাশে বসে। এরই মধ্যে ১৯৭২-এর ২৪ এপ্রিল যামিনী রায়ের মৃত্যু ঘটলে বিষ্ণু দে পরপর কয়েক দিন কীরকম আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন, তা বলেছেন প্রণতি।

চার.

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এম-এ ক্লাসে বিষ্ণু দে-র সহপাঠী বন্ধু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে পাশ করেন ১৯৩৩-এ। তাঁদের সঙ্গে আর ছিলেন প্রণতি রায়চৌধুরী, ক্ষিতীশ রায়, শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, বরেন্দ্রপ্রসাদ রায় প্রমুখ। এবার কিন্তু দুই বন্ধু সত্যিই প্রায় সমান বয়সী। যামিনী ও সুধীন্দ্র যদি বিষ্ণু-র জ্যেষ্ঠ বন্ধু হয়ে থাকেন, খুবই স্বাভাবিক, জ্যোতিরিন্দ্র কনিষ্ঠ, বোধহয় দু-বছরেরও কমে। বন্ধুত্ব অখণ্ডনীয়— একদিকে খাঁটি কলকাতার ছেলে বিষ্ণু, আরেক দিকে পাবনার শীতলাই গ্রামের বটুক (জ্যোতিরিন্দ্রের সর্বস্বীকৃত ডাকনাম)। ওঁরা ছিলেন 'সহ-বেঞ্চার'— পেছনের বেঞ্চে বসে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন। তখন থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্যচর্চার দিকে ঝোঁক তৈরি হয়, বিষ্ণু দে-র অনুকরণে। প্রায় একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের দিকে, জ্যোতিরিন্দ্র নিজেই বলেছেন সে-ব্যাপারে ছিল নীরদ চৌধুরী ছাড়াও বিষ্ণু ও তাঁর বন্ধু চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের তাত্ত্বিক সহায়তা। ছিল তো বটেই রবীন্দ্রনাথ ও পঞ্চভাস্করের গান। বিষ্ণু দে ছিলেন তারও একান্ত অনুরাগী। দুজনের ছেদহীন এই সম্পর্ক তো চলতেই থাকে—বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-এর আড্ডায়। 'পরিচয়' ও 'কবিতা'র লেখাও। প্রথমটিতে প্রবন্ধ ও কবিতা, পরেরটিতে শুধুই কবিতা। কবিতাতে বিষ্ণু দে-র অনুসরণ যেন আরো স্বচ্ছ। জ্যোতিরিন্দ্রের মার্কসবাদী বিশ্বাস ও সাম্যবাদী রাজনীতিতে

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র   শিল্পী : সত্যজিৎ রায়

নিষ্ঠা, এবং সেই সূত্রেই 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ', 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' ইত্যাদিতে যোগদানে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, অন্তত বিষ্ণু দে-রই প্রভাব। অবশ্যই ক্রমশ তাঁর খ্যাতি সংগীতসৃজনে, এবং সুরকার হিশেবে। জ্যোতিরিন্দ্রের সংগীত- রচনায় 'নবজীবনের গান', 'ঝঞ্ঝার গান', 'এসো মুক্ত করো'-তে যেন বিষ্ণু দে-রই অধিকার। সাহিত্য, সংগীত, সংগঠন সব মিলিয়ে যে-বটুক, সেই বন্ধুত্বের নিবিড়তা তাঁর উচ্চারণে :

যে চঞ্চল, যে সুদূরতাকে চির করেছে পিয়াসী,
যে বুভুক্ষু খুঁজে ফেরে তাঁর নবজীবনের গান,
যে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় চিত্ত তার অশান্ত প্রয়াসী
যার সুর মর্মরিত অহর্নিশি তন্নিষ্ঠ হৃদয়ে তার,
কারণ শুনেছে সে যে গান আকাশে পাতিয়া তার গান
গম্ভীর পৃথিবী যার মৃদঙ্গে নিয়ত বলে : ধ্যান ভাঙো ধ্যান
একটি আকাশ ভেঙে হাজার আকাশ, হাজারের নীলাকাশ...

তবু, জ্যোতিরিন্দ্রের আর্থিক সংকট ঘোচে না, তিনি দিল্লি চলে যান তার সুরাহা করতে। অনেকদিন, প্রায় ১৫ বছর রয়ে যান সেখানে—অবলম্বন সংগীতের শিক্ষকতা, সংগীতের নানামুখী পরিকল্পনা ইত্যাদি। সেখানে কবিতাও লিখতে থাকেন অনেক। বিষ্ণু তখনও তাঁর প্রেরণা। তাঁকে নিবেদন করেই লেখেন 'আরোগ্যেই যেন শেষ হয়' কবিতাটি। নিজের ইতস্তত কিছু কবিতা বিষ্ণুকে পাঠিয়ে চিঠিতে বলেন, "এর ভেতরকার কবিতাগুলো তুমি আমার কাব্য- সঞ্চয়নের জন্য সিলেক্ট করতে পারো"। দিল্লিতে খুব একটা থিতু হতে পারেনি। বিষ্ণু-প্রণতির সবসময় চিন্তা কী করে কলকাতায় এসে স্থায়ী কিছু করতে পারেন বটুক। মাঝে-মাঝে তাই তাঁকে আসতেই হয় কলকাতায়। বিষ্ণু দে-র জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' নিয়ে দিল্লিতে একটি নৃত্যগীত-আলেখ্য নির্মাণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। কথা ছিল, কলকাতাতেও সেটি হাজির করা হবে—বিষ্ণু দে তো বটেই, শম্ভু মিত্রও থাকবেন পেছনে। কিন্তু, বটুকের স্ত্রী-র আকস্মিক মৃত্যুতে সব বানচাল হল। তারপর সত্যিই ১৯৭৪-এ তিনি স্থায়ীভাবে এলেন কলকাতায়। কমলা গার্লস স্কুলে, ইন্দিরা সংগীতায়তনে, পাঠভবন বিদ্যালয় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রায় পেশাদারি নিষ্ঠায়। অনেক পুরোনো ও নতুন বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটল। তবে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে সম্পর্ক তো ছেদহীন। দুই বন্ধুর কথাবার্তা, হাস্য-পরিহাস, পত্রবিনিময়। জ্যোতিরিন্দ্র কখনো-কখনো সাঁওতাল পরগনার রিখিয়া গ্রামে যান, কবির বিশ্রামস্থানে। চমৎকার সময় কাটে প্রকৃতিতে, এবং বিষ্ণু দে-র পুত্রকন্যা আর নাতি-নাতনিদের সাহচর্যে। বটুকের মেয়ে সুস্মিতার গল্প করেন প্রণতি- বিষ্ণু। জ্যোতিরিন্দ্র শেষ জীবনে 'কর্ষণী' নামক কৃষি-পরিকল্পনায় তৎপর। বিষ্ণুকে তার গল্প করেন। হাস্যমুখর বিষ্ণু শোনেন। কিন্তু শরীর বটুকের ভালো নয়। তাও জানান চিঠিতে। এরই মধ্যে, কয়েক বছরের পার করেই, ১৯৭৭-এ হঠাৎ, হায়দ্রাবাদে অবস্থানরত ছেলের কাছ থেকে ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় বটুকদার মৃত্যু। বিষ্ণুর কাছেও খবর এলো —অসহনীয় এই বিদায়! এর পর দীর্ঘকাল হঠাৎ-হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় রিখিয়ায়, প্রণতির স্মৃতিচারণে শুনেছি, বিষ্ণু দে ঘুমচোখে বলে ওঠেন, বটুক এসেছে!